



চৈতন্যালোকে বাংলার গৌণ ধর্মসম্প্রদায়

রাহুল দাস

স্নাতোকোত্তর (দ্বিতীয় বর্ষ), ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

West Bengal, India

rahulfulia2021@gmail.com

প্রবন্ধসার

বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যযুগ নানা অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনায় আবর্তিত। এইসময় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের রক্ষণশীলতা ও মুসলিম শাসকের আগ্রাসন সাধারণের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, থমকে গিয়েছিল তৎকালীন সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। এমনই এক সংকটপূর্ণ সময়ে নদীয়ার নবদ্বীপে আবির্ভূত হন যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব যিনি নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বাংলা তথা বাঙালির চেতনায়। জাত-ধর্ম-বর্ণের কঠিন শৃঙ্খলা তথা নানা সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবের পরিত্রাতা হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। একাধারে তিনি যেমন নব ভক্তি আন্দোলনের পুরোধা, অন্যদিকে তাঁর উদারনৈতিক জীবন দর্শনের দ্বারা বাংলার সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধ। তাঁর দর্শনে বাহ্যাদৃষ্টির পরিবর্তে ভক্তিই হয়ে উঠেছে ভক্ত-ভগবানের মিলনের একমাত্র সেতুবন্ধন। তিনি সমাজের অচলায়তন ভেঙ্গে উন্মোচন করেছিলেন উদার মানব প্রেমের দ্বার। নিজে বাংলা সাহিত্য না রচনা করেও পুষ্ট করেছেন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাকে। বাংলা সঙ্গীত জগতে কীর্তন তথা বিভিন্ন লোকসংগীতেও চৈতন্যের ধারা বহমান; এমনকি রবীন্দ্রনাথের গানেও। পাশাপাশি, চৈতন্যোত্তরকালে তাঁর ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে জাতবৈষম্য, কর্তাভজা, বাউল, সাহেবধনী, খুশি বিশ্বাসী, মতুয়া প্রভৃতির মতো বহু গৌণ ধর্মসম্প্রদায়। একটি অখণ্ড আয়নায় একটি সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়;



কিন্তু তা খণ্ডিত হলে তাতে যত সংখ্যক খণ্ড তত সংখ্যকই সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়; এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।
বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুধাবিভক্ত হলেও তাতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব পূর্ণাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আর এই
গৌণধর্মসম্প্রদায়গুলির সামগ্রিক যাপনের মাধ্যমে পরিপুষ্ট হয়েছে বাংলার সংস্কৃতি।

সূচক শব্দসমূহ: শ্রীচৈতন্যদেব, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ, গৌণধর্ম, উদারভাবধারা, লোকসঙ্গীত।

মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ধারায় সমাজে অনাচার, দুর্নীতি, জাতিভেদ প্রথা, বর্ণাশ্রম ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে
সমাজে অস্পৃশ্যতা, বিদ্বেষ, হানাহানির সাথে নানা কুসংস্কার দেখা দিলে মানুষের সমাজ জীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত।
স্বৈরাচারী রাজশক্তি ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের শোষণের ফলে সাধারণ দরিদ্র মানুষ হয়ে ওঠে দিশাহারা।
সামগ্রিকভাবে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম অবক্ষয়ের পথে নিমজ্জিত হয়। এইরকম একটি অস্থির
প্রেক্ষাপটে নদীয়ার নবদ্বীপভূমিতে ‘আলোকবর্তিকা’ হিসাবে আবির্ভূত হন যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-
১৫৩৩/৩৪ খ্রি:)। তাঁর মহাজীবনের প্রভাবে সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি জাতিধর্মের উর্ধ্বে
উঠে আদিজচণ্ডালে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হয়ে উদার প্রেমধর্মী, মানবতার জয়গান ঘোষণা করেন।
তিনি আহ্বান করেন- “চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হরি ভক্তি পরায়ণঃ” (রায় ও ব্যানার্জী, ২০২১, পৃ. ১৬৫); অর্থাৎ,
একজন চণ্ডালও দ্বিজ থেকে শ্রেষ্ঠ যদি তাঁর মধ্যে হরিভক্তি থাকে।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য ছিলেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজ জীবনদর্শন দিয়ে সমগ্র বাংলার সমাজ
সংস্কৃতিতে এক যুগান্তরকারী আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই আন্দোলন ছিল মধ্যযুগীয় বাংলার নবজাগরণ
স্বরূপ, ‘চৈতন্য রেনেসাঁস’। শ্রীচৈতন্য নিজ জীবদ্দশায় এবং তাঁর উত্তরকালে নিজের দিব্যজীবনের দিব্যজ্যোতিতে
সমানভাবে প্রভাবিত করেছেন বাংলার সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বৃহত্তর ক্ষেত্রকে; নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার
করেছেন বাঙালি জীবনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন
হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পর বাংলাদেশের সেই অবস্থা



আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল” (রায় ও ব্যানার্জী, ২০২১, পৃ. ২০১-২০২)। বাংলা ও বাঙালির চেতনায় চৈতন্য প্রভাবের এই সুবৃহৎ পরিসরে রয়েছে চৈতন্যোত্তর যুগে উদ্ভূত বাংলার বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মগুলি। এইসব গৌণধর্ম মতাবলম্বীদের জীবনধারা এবং তাঁদের সাধনমার্গের অঙ্গ হিসাবে রচিত অসংখ্য গান বাংলা সংস্কৃতির একটি অমূল্য দলিল।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে যে ভক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এক নব উদারনৈতিক ভাবধারা— ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ’। কিন্তু চৈতন্যোত্তরকালে বাংলায় গড়ে ওঠা লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলি ধীরে ধীরে বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতিতে স্থান করে নেয় এবং গৌণধর্ম হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যার শিকড়ে ছিল শ্রীচৈতন্যের উদার ভক্তিরসের প্রকাশ। শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পর বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নানারকম সংকীর্ণতা ও তত্ত্বগত পার্থক্য দেখা যায়; গোঁড়া বৈষ্ণবদের অনুদার সংকীর্ণ নীতি ও বিভিন্ন গুরুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বৈষ্ণবীয় সমাজকে সংকটের মুখে নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৭৫৭-এর পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় রাজনীতির রদবদল ঘটলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের সূচনা ঘটে। এর মধ্য দিয়েই বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ওঠে এবং ফলস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের উদার জাতি-ধর্ম-বর্ণবিহীন মনুষ্যত্বের চিন্তার অপমৃত্যু ঘটে; গুরু-মহন্তদের দ্বারা ভক্তরা উপেক্ষিত, নির্যাতিত হতে থাকেন। চণ্ডাল, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি সমাজের প্রান্তবর্গীয় মানুষেরা নির্মম শোষণ ও উপেক্ষার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে থাকেন এবং তাঁরা বেদ, কোরান, মন্দির, মসজিদ, বাহ্যাদেশের পূজা-অর্চনা প্রভৃতি নিয়মের গণ্ডি অতিক্রম করে মানবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ধারায় যুক্ত হয় বৌদ্ধধর্ম, ভক্তি ও সুফিবাদের প্রভাব (গুপ্ত, ১৯৫৬, পৃ. ৮৪)। এইভাবে চৈতন্যোত্তর পর্বে উদ্ভব ঘটে নানা লৌকিক ধর্মের; যার মূলে ছিল শ্রীচৈতন্যের উদার ভাবধারা। এইপ্রসঙ্গে বরুণ চক্রবর্তী তাঁর ‘চৈতন্য পরিক্রমা’ গ্রন্থে বলেছেন, “সাহেবধনী, লালনশাহী, কর্তাভজা প্রভৃতি লোকধর্মগুলির উদ্ভবের মূলে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবই সবিশেষ কার্যকরী হয়েছে। তিনিই শোষিত মানুষদের কাছে পরিত্রাতারূপে বিবেচিত



হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত উদার বৈষ্ণব মতই নানা লোকধর্মের আধার রূপে গ্রহীত হয়েছিল” (চক্রবর্তী, ব., ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩)।

বাংলায় চৈতন্যদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গড়ে ওঠা নানা লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির সংখ্যার ক্ষেত্রে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো রচনায় এর সংখ্যা ১৩, কোথাও ৫২, আবার কোথাও বা শতাধিক। সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও এঁদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাধনপদ্ধতি বাংলার সাধন-সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। তবে কালের প্রবাহে এগুলির সিংহভাগই অবলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অবশিষ্টগুলিও অবলুপ্তির পথে ধাবমান। সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে না গিয়েও বলা যায়, এইসব গৌণধর্মগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রচার-প্রসার অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। এরকমই কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য গৌণ ধর্মীয় সম্প্রদায় হল জাতবৈষ্ণব, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বাউল, বলরামভজা, সহজিয়া, খুশি বিশ্বাসী, মতুয়া ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চৈতন্য পরবর্তীকালে গোটা বাংলায় বিভিন্ন লোকায়ত সম্প্রদায় গড়ে উঠলেও তার অধিকাংশই ছিল অবিভক্ত নদীয়াকেন্দ্রিক। বর্তমান প্রবন্ধে উপরোক্ত কয়েকটি বিশেষ বিশেষ লোকধর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বাংলার সংস্কৃতিতে শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হল।

জাতবৈষ্ণব সম্প্রদায়: মহাপ্রভুর উদার ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলার যে সকল উপসম্প্রদায় গড়ে ওঠে তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ‘জাতবৈষ্ণব’। এই ধারায় বিভিন্ন জাতের মানুষ মূল বৈষ্ণবধর্মে না গিয়ে পৃথক বৈষ্ণবীয় সমাজ গঠন করে বলে একে ‘জাতবৈষ্ণব’ বলা হয়।

দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব উপাসক তোতারাম আঠারো শতকে নবদ্বীপ বাসকালে যে তেরোটি অচ্ছুৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ করেন তার মধ্যে একটি হল ‘জাতগোঁসাই’। এটিই হল ‘জাতবৈষ্ণব’ সম্প্রদায়। তবে, এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব প্রসঙ্গে সঠিক তথ্য আজও ধোঁয়াশার আড়ালে। অনেকের মতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বাইরে অজানা বৈষ্ণবেরা অন্ত্যজ জাতির মানুষদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং তা থেকেই জাতবৈষ্ণবের উদ্ভব।



তবে, অজিত দাস তাঁর ‘জাতবৈষম্য কথা’-তে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “অনুমিত হয়, নিত্যানন্দ এবং অভিরাম দাসের নেতৃত্বেই জাতবৈষম্য সমাজের গোড়াপত্তন হয়েছিল, কোন গ্রাম্য বাবাজীর দ্বারা নয়। অভিরাম দাসের মতো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বলা যায় না যে জাতবৈষম্য শুধুই নিম্ন বর্ণের মানুষ নিয়ে গড়া দল” (দাস, ১৯৬০/২০১৫, পৃ. ৪৫)।

মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় ধারা থেকে বেড়িয়ে এলেও এঁরা চৈতন্যোপাসক। বর্ণাশ্রমবিরোধী জাতবৈষম্যবেরা মনে করতেন, যেকোনো বর্ণের বা ধর্মের মানুষ বৈষ্ণবতা গ্রহণ করে এই সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন। চৈতন্যোত্তরকালে বহু উপসম্প্রদায় গড়ে উঠলেও জাতবৈষম্য সম্প্রদায় ছিল সুবৃহৎ ও সুসংহত। এই সমাজের দুটি ভাগ— গৃহী জাতবৈষম্য সমাজ এবং আখড়া-কেন্দ্রিক বাবাজী বৈষ্ণবী অধ্যুষিত সমাজ (দাস, ১৯৬০/২০১৫, পৃ: ১১)। উদার চৈতন্য ভাবধারায় প্রভাবিত এই সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ছিল বর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবদের থেকে ভিন্ন। এঁদের বিবাহ, মৃতের সংস্কার, পারলৌকিক ক্রিয়া— সর্বত্রই দেখা যায় অনাড়ম্বর আয়োজন। এই সমাজে বিবাহ সম্পন্ন হয় মালা-চন্দনে। মৃতের সংস্কার হিসাবে সমাধি দান নয়তো বিকল্প হিসাবে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু অগ্নিদাহ করা হয় না (দাস, ১৯৬০/২০১৫, পৃ. ৮৪)। এঁদের পারলৌকিক ক্রিয়াও বেশ সাধারণ; বৈদিক রীতির শ্রাদ্ধকর্ম, পিণ্ডদান, পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ— কোনো কিছুই নেই এই সমাজে। পরিবর্তে “চৈতন্যপূজোর আয়োজন হচ্ছে। ভোগরাগ সাজানো হচ্ছে। ভোগরাগ বলতে মালসা ভোগ।...চৈতন্যপূজো শেষ হলেই, সেই ভোগের প্রসাদ খেলেই অশৌচমুক্ত। ভোগারতির সময় চলবে কীর্তন গান। তারপরে হবে মচ্ছব (মহোৎসব)” (দাস, ১৯৬০/২০১৫, পৃ. ৮৩)। এই সম্প্রদায় চৈতন্য পরবর্তীতে বিভিন্ন গৌণধর্ম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বৃহৎ ভূমিকা পালন করেছিল। তাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণঘেষা সমাজের বিরুদ্ধে যে অভিনব সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন তার ফলশ্রুতিতে বহু লোকধর্মের উদ্ভব ঘটে।



কর্তাভজা সম্প্রদায়: শ্রীচৈতন্যের উদারচিত্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত গুরুত্বপূর্ণ লোকধর্ম সম্প্রদায়টি হল কর্তাভজা সম্প্রদায়। ‘কর্তা’ অর্থে ঈশ্বর এবং তাঁকে যারা ভজনা করেন, তাঁরাই হল ‘কর্তাভজা’। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব ইতিহাস যেমন কিংবদন্তি নির্ভর তেমনই বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ডে ভরপুর। প্রচলিত মতানুসারে, আউলচাঁদ নামক এক উদাসীন ফকির ‘কর্তাভজা’ সম্প্রদায়ের সূত্রপাত ঘটান (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ. ৪৩)। এই আউলচাঁদের আবির্ভাব ও এই ধর্মের উদ্ভব প্রসঙ্গে জানা যায়, আউলচাঁদ উলা গ্রাম (অধুনা বীরনগর)-এর মহাদেব বারুই-এর পানের বরজে আটবছর বয়সে আবির্ভূত হন। তারপর দীর্ঘ উনিশ বছর বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে ২৭ বছর বয়সে তিনি নদীয়া জেলার চাকদহের নিকটস্থ ‘বেজরা’ গ্রামে উপস্থিত হয়ে প্রথমে হট্ট ঘোষ এবং পরবর্তীকালে রামশরণ পালসহ আরও ২২ জন শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে আনুমানিক ১৭৫৭ সালে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন (দত্ত, ১৮৮৮, পৃ. ১৮৭; চক্রবর্তী, সু., ২০০৩, পৃ. ৭১)। এঁরাই কর্তাভজা ধর্মের ইতিহাসে ‘বাইশ ফকির’ নামে পরিচিত।

প্রচলিত মতানুযায়ী, আউলচাঁদ হলেন গোরাচাঁদ অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্যের অবতার। শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথের মন্দিরে গোরাচাঁদ হারিয়ে যান এবং তারপরে তিনি আউলচাঁদের রূপ নিয়ে ঘোষপাড়ায় আবির্ভূত হন। তিনিই হলেন আদিকর্তা। এই যুগে তিনি দেহ ধারণ করেছেন গৃহীদের জন্য, কর্তাভজা ধর্মের পথ তৈরির জন্য(চক্রবর্তী, সু., ১৯৮৯/২০১৮, পৃ. ৫৩)।

বিভিন্ন মতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের শাখা হিসেবে কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় নতুন উপসম্প্রদায় হিসেবে কর্তাভজার উত্থান ঘটে। J.H.E. Garrett তাঁর ‘Bengal District Gazetteers, Nadia’ গ্রন্থে বলেছেন, “*The Kartabhaja Sect was founded about the middle of the eighteenth century and took its origin at the village of Ghoshpara, in the Chakdaha thana*” (Garrett, 1910, page: 63)।

‘কর্তাভজা’ বাংলার একটি অন্যতম লোকধর্ম। এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদ, প্রতিষ্ঠাতা রামশরণ পাল, ধর্মকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন রামশরণপত্নী সরস্বতী দেবী যিনি কালক্রমে ‘সতীমা’ বা ‘শচীমা’ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এই ধর্ম জনপ্রিয়তার শীর্ষে উন্নীত হয় রামশরণসুত রামদুলাল ওরফে দুলালচাঁদ (কর্তাভজাদের ভাষায় ‘লালশশী’)-এর হাত ধরে। উদার মানসিকতাসম্পন্ন বাস্তববাদী আউলচাঁদ ভক্ত সমাজে ‘আউলে মহাপ্রভু’, ‘আউলে গোঁসাই’, ‘কাঙ্গালী মহাপ্রভু’, ‘পাগলা ফকির’ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই ধর্মে বিশ্বাসী মাত্রই মানেন সব ধর্ম, সব আচার সত্য এবং সব মানুষই বিশ্বকর্তার সন্তান। এঁরা বিশ্বাস করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ এবং আউলচাঁদ একই সত্তা। কর্তাভজাদের একটি পদে পাওয়া যায়—

“ কৃষ্ণচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, আউলে চন্দ্র

তিনেই এক একেই তিন।”

(বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ. ৪৭)

যদিও পরবর্তীতে আউলচাঁদের স্থানে দুলালচাঁদকে বসিয়ে কর্তাভজা মতকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়—

“তিন এক রূপ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র, ও শ্রীদুলালচন্দ্র

তিন নাম বিগ্রহ স্বরূপ।”

(বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ. ৪৮)

কর্তাভজাদের মধ্যে দেখা যায় এই উদার, সমন্বয়বাদী দর্শন। শ্রীচৈতন্য চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সম্প্রদায় মানবতার জয়গান গেয়েছে। জাতিভেদের উর্ধ্বে কর্তাভজারা সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেন যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ‘ভাবের গীত’-এ যেখানে লালশশী ঈশ্বর শব্দের পাশাপাশি ‘খোদা’ শব্দের ব্যবহার করেছেন।



এই লোকধর্ম তৎকালীন শহুরে শিক্ষিত মানুষদের দ্বারা বিবিধভাবে সমালোচিত হলেও তৎকালীন গোড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায়ের আদর্শ এক প্রতিবাদস্বরূপ। ঘোষপাড়ার মেলার প্রত্যক্ষদর্শী নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন- “ঘোষপাড়ায় জাতিভেদ নাই, তাহারা সকলে এই রন্ধনশালা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করে এবং এজন্যই বৎসর বৎসর আসেন।...ঘোষপাড়া কর্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র” (সেন, ১৩৬৩, পৃ. ২০০)। শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত এই ধর্ম আজও স্বমহিমায় দণ্ডায়মান। আজও কল্যাণীর ঘোষপাড়া দোলপূর্ণিমা তিথিতে ভক্তের সাগরে ভেসে যায় এবং আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয় সতী মায়ের জয়ধ্বনিতে।

সাহেবধনী: এই লোকধর্মের ধারায় অন্যতম ছিল সাহেবধনী যারা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-যন্ত্রণা, প্রেম, উপেক্ষিত জীবনের বিভিন্ন জীবন্ত চিত্র তাদের সাধন-সংগীতে মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। প্রচলিত ধারণানুসারে, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের সাহেবধনী নামে এক মুসলমান মহিলা এই গৌণ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক। ‘সাহেবধনী’ সম্প্রদায়ের কুবির গোঁসাই-এর লেখায় পাওয়া যায়—

“ সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটি শুনি
সেই ধনী সেই সাহেবধনী
জঙ্গিপুরে যার মোকাম।”

(চক্রবর্তী, সু., ১৯৯৮/২০১৮, পৃ. ২৬; বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ. ১০৩)

নদীয়া জেলার দোগাছিয়া শালিগ্রাম নিবাসী মুলিচাঁদ পাল তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে ‘সাহেবধনী’ সম্প্রদায়ের পত্তন করেন এবং তাঁর পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়কে জনপ্রিয় করে তোলেন। এদের উপাস্য ‘দীনদয়াল’ বা ‘দীনবন্ধু’ এবং উপাসনা স্থানের নাম ‘আসন’। প্রতিবছর অগ্রদ্বীপে এদের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও প্রতি বৃহস্পতিবার দীনদয়ালের নামে ভোগরাগ নিবেদিত হয় (মল্লিক, ১৩১৭/২০২২, পৃ. ২০৮)।



সাহেবধনীরা বিশ্বাস করেন যে, ঘোষপাড়ায় আবির্ভূত চৈতন্যাবতারই জঙ্গিপু্রে সাহেবধনী (রাধা) হিসাবে আবির্ভূত হন। এরাও বৈষ্ণবীয় উদার ভাবধারার জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্বে ছিলেন। নদীয়ার সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের পথপ্রদর্শক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাই তাদের ধর্মান্তর্গত বৈষ্ণবীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বাউল সম্প্রদায়: চৈতন্যোত্তর পর্বে উদ্ভূত বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের ওপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সম্প্রদায়েরও উৎপত্তিস্থল নদীয়া। হরিগুরু, বনচারী, সেবা কমলিনী, ও অখিলচাঁদ— এই চারজন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন বলে মনে করা হয়।

বাউলদের মতে, “যাহা নাই ভাঙে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে, তাহা নয় ব্রহ্মাণ্ডে” (মল্লিক, ১৩১৭/২০২২, পৃ. ২০৮)। বাউলের কোনো ধর্ম নেই, নেই কোনো বিশেষ ভেদ। তাদের পরম অশ্বেষণের বিষয় হল ‘মনের মানুষ’; যা কোথাও খোদা, কোথাও মহম্মদ, কোথাও কৃষ্ণ আবার কোথাও গৌরাঙ্গ। বাউলেরা শ্রীচৈতন্যকে ‘মহাগুরু’ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হয়ে এই ধর্মের তত্ত্বপ্রচার করেছেন (ঘোষ, ১৯৮৬, পৃ. ১০২)। বাউল সম্প্রদায়ের একজন মরমিয়া সাধক ছিলেন লালন ফকির। তাঁর বহু গানেই চৈতন্যজীবন ও চৈতন্যাবতার সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব উঠে এসেছে। তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেম ও চৈতন্যপ্রেমে বিভোর। তিনি লিখেছেন—

“যদি আমার গৌরচাঁদকে পাই।

গেল গেল এ ছার কুল তাতে ক্ষতি নাই।”

(রায় ও ব্যানার্জী, ২০২১, পৃ. ৮৩)

লালনের গানে ‘নদের নিমাই’-এর প্রেমময় জীবনের প্রাণবন্ত রূপের প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীচৈতন্য হয়ে উঠেছেন একজন অসাম্প্রদায়িক মানবপ্রেমিক সাধক। লালন বলেন—

“এনেছে এক নবীন গোরা

নতুন আইন নদীয়াতে।



বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে।

সেই আইনের বিচারমতে।।”

(চক্রবর্তী, সু., ১৯৮৯/২০১৮, পৃ. ১৮০)

বাউল গানের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব গানগুলির সৌন্দর্য্য ও সুষমা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।

সহজিয়া সম্প্রদায়: বাংলার লোকধর্মের ইতিহাসে ‘সহজিয়া’ একটি অন্যতম নাম। বহুযুগ ধরে এই ধারা প্রচলিত হলেও চৈতন্যোত্তরকালে এর সাথে বৈষ্ণবীয় ধারার সংমিশ্রণ ঘটে সৃষ্টি হয় ‘সহজিয়া বৈষ্ণব’। উদারপন্থী বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রের কঠোরতা অস্বীকার করে গুরু-আখড়ার মধ্য দিয়ে সহজিয়া মতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সহজিয়া বাউলেরই ভেদমাত্র। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবস্থলও নদীয়া (মল্লিক, ১৩১৭/২০২২, পৃ. ২০৯)। এরা অন্তরঙ্গ যোগসাধনার সঙ্গে দেহতত্ত্বের মিশ্রণ ঘটিয়েছে, তাদের প্রধান লক্ষ্য নিজের মধ্যে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা।

বলরাম ভজা সম্প্রদায়: চৈতন্যোত্তরকালে বাংলার উপসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ‘বলরাম ভজা’। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন অবিভক্ত নদীয়ার মেহেরপুর নিবাসী বলরাম হাড়ি। বলরাম প্রবর্তিত এই সম্প্রদায়ের পাঁচরকম নাম পাওয়া যায়— ‘বলরামি’, ‘বলরাম ভজা’, ‘বলরামচন্দ্রের ধর্ম’, ‘বলাহাড়ি’ এবং ‘হাড়িরাম সম্প্রদায়’। বৈষ্ণবদের মতো ভিক্ষাপঞ্জীবী বলরামীরা মানুষভজনে বিশ্বাসী। তাঁদের বিগ্রহহীন এই সাধনার একমাত্র উপাস্য হল হাড়িরাম। এঁরা কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক পোশাক পরিধান করেন না। বলাহাড়িরা অবতারতত্ত্বে বিশ্বাসী না হলেও তাদের গানে প্রকাশ পেয়েছে চৈতন্যের কথা; ছিন্নবেশী, উদাসী গোরাচাঁদ হয়ে উঠেছেন বলরাম হাড়ির মানবিক মূর্তি। গানে পাওয়া যায়—

“নবদ্বীপে এসে ছিন্নবেশে কেঁদে গেল শচীর গোরা...

কলি কালে মেহেরপুরে পূর্ণ মানুষ দেখ সে তোরা।”



(চক্রবর্তী, সু., ১৯৮৬, পৃ. ৪৯)

খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়: চৈতন্যোত্তরকালে বাংলায় বৈষ্ণবীয় আদর্শকে সামনে রেখে যেসকল গৌণ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব ঘটে; তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ‘খুশি বিশ্বাসী’ যার প্রবর্তন করেন এক মুসলমান সাধক। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থে বলেছেন, “কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত দেবখামের নিকটে ভাগা নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ গ্রামনিবাসী খুশি বিশ্বাস নামে এক মুসলমান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক” (দত্ত, ১৮৮৮, পৃ. ২০৫)।

এঁদের কাছে ভগবান নয়, একমাত্র গুরুই সত্য। তাদের আদিগুরু খুশি বিশ্বাসই হলেন নবকলেবরে আবির্ভূত শ্রীচৈতন্যদেব। জাতিভেদ প্রথার উর্ধ্বে এই সম্প্রদায় সর্বদা সাধন, সঙ্গীত, ধর্মীয় নির্দেশ ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়বাদের জয়গান গেয়ে গেছে। চৈতন্যের উদার জীবনধারা, উন্মুক্ত চেতনায় এদের বেটো থাকার রসদ জোগায়।

মতুয়া সম্প্রদায়: বাংলা লোকসংস্কৃতি তথা জনসমাজে বহুল চর্চিত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গৌণ ধর্মসম্প্রদায় হল ‘মতুয়া’ যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে ‘মতুয়া’ ধর্মোন্দোলনের মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্র সমাজে এক জাগরণ ঘটে। তাঁদের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরকে কেন্দ্র করে সমাজের প্রান্তিক, শ্রমজীবী দলিত সমাজের মানুষকে নিয়ে উচ্চবর্ণের শোষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাই ‘মতুয়া আন্দোলন’ নামে খ্যাত। মতুয়া ধর্মের শাস্ত্রীয় আধার ‘শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত’ গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ‘শ্রীচৈতন্যের নবরূপ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে (বিশ্বাস, ২০০৯, পৃ. ১১৫)। এঁদের প্রচলিত বিশ্বাস, সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, পতিত শ্রেণির মানুষদের শোষণমুক্ত করতে যুগাবতারদের ধরায় অবতরণ ঘটে। তাদের কাছে শ্রীচৈতন্য, শ্রীহরিচাঁদ ও শ্রীগুরুচাঁদ এক এবং অভিন্ন সত্তা।



দেশভাগের পরে মতুরা এপাড় বাংলায় চলে আসে এবং উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁতে নিজেদের বাসভূমি গড়ে তোলেন; বনগাঁ হয়ে ওঠে ‘মতুরাগড়’। শুধুমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের সর্বস্তরে অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মতুরা গভীর ছাপ রেখেছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখা গেল কীভাবে চৈতন্যোত্তর বাংলায় চৈতন্যালোকে বিভিন্ন লোকায়ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। এই গৌণধর্মগুলি নানাভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি হল সেই সামগ্রিক জ্ঞান, বিশ্বাস, অভ্যাস, গুণ চর্চা ও অন্যান্য মানবিক গুণ যা সুদীর্ঘকাল ধরে মানবসমাজ বহন করে চলেছে। সংস্কৃতি তাই মানবের গতিশীল চেতনার দ্যোতক যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মানবের প্রতিটি কর্মে। ফলে শ্রীচৈতন্য যেমন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে রেখেছেন তেমনি তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই গৌণ ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিও বাংলার লোকসংস্কৃতিকে পুষ্ট করে তুলেছে। এঁদের ধর্মীয় আচার, সরল জীবনদর্শন— বাংলার সমৃদ্ধ তথা বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির দ্যোতক।

বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই সম্প্রদায়গুলির প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এই লোকায়ত ধর্মগুলির সাধনরীতি ও দর্শন প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল সঙ্গীত যা বাংলার লোকসঙ্গীত তথা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। যেমন— বাউল সম্প্রদায়ের ‘বাউল গান’ লোকসঙ্গীতের একটি জনপ্রিয় শাখা যার মধ্যে দেখা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মানবদর্শনের কথা। আবার সাহেবধনী, বলাহাড়ি, সহজিয়া প্রভৃতির গান আজও গ্রাম বাংলার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় যার মূলে রয়েছেন ‘নবদ্বীপচন্দ্র’। শুধু লোকসঙ্গীত নয়, রবীন্দ্রনাথের গানেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তাঁর ‘পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে’ গানে দেখা যায়, “বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা/ কোন্ বলরামের আমি চেলা...” (ঠাকুর, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ/১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮০)। রবীন্দ্রনাথের বহু গান বাউল সুরাশ্রিত।

চৈতন্যপরবর্তী সময়ে উদ্ভূত লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আজও স্বমহিমায় বিরাজ করছে ‘কর্তাভজা’ ও ‘মতুরা’। এঁদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান যথাক্রমে সতীমার মেলা ও হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বারুণীর স্নান



Journal of Cultural Research Studies
Volume V, Issue I, 2026. (ISSN 2583-6137)
A Blind Peer-Reviewed International Multidisciplinary
Online Open Access Journal. Published by **DRAFT**

বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। এইভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অন্যান্য ধারার মতোই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রান্তিক ধারাকেও স্বমহিমায় প্রভাবিত করে তুলেছেন।



গ্রন্থপঞ্জী

- গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.) (১৯৫৬): *শ্রীচৈতন্য: একালের দৃষ্টিকোণ*, কলকাতা: যুগ প্রকাশনী
- ঘোষ, ডক্টর প্রদ্যোত (সম্পা.) (১৯৮৬): *শ্রীচৈতন্য: জীবন- সাহিত্য-দর্শন*, মালদহ: মালদহ জিলা শ্রীমন্মহাপ্রভু
শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চাশত জন্মজয়ন্তী মহোৎসব কমিটি
- চক্রবর্তী, বরুণ (সম্পা.) (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ): *চৈতন্য পরিক্রমা*, কলকাতা: খিদিরপুর হরিসভা
- চক্রবর্তী, সুধীর (২০১৮): *গভীর নির্জন পথে* (নবম মুদ্রণ), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (প্রথম
প্রকাশ ১৯৮৯)
- চক্রবর্তী, সুধীর (২০০৩): *বাংলার গৌণধর্ম সাহেবধনী ও বলাহাড়ি*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি
- চক্রবর্তী, সুধীর (১৯৮৬): *বলাহাড়ি সম্প্রদায় আর তাদের গান*, কলকাতা: পুস্তক বিপণি
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪১৯ বঙ্গাব্দ) *গীতবিতান*, কলকাতা: বিশ্বভারতী (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)
- দাস, অজিত (২০১৫): *জাতবৈষ্ণব কথা* (ধ্রুবপদ সংস্করণ), কলকাতা: ধ্রুবপদ প্রকাশনী (প্রথম প্রকাশ ১৯৬০)
- দত্ত, অক্ষয়কুমার (১৮৮৮): *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়*, প্রথম ভাগ, (দ্বিতীয় সংস্করণ), নিউ সংস্কৃত প্রেস,
কলকাতা
- বিশ্বাস, বাসুদেব (২০০৯): *কর্তাভজা সম্প্রদায়: বাংলার একটি গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের সমন্বয়বাদী ঐতিহ্য*, কল্যাণী:
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
- মল্লিক, কুমুদনাথ (২০২২): *নদিয়া কাহিনী*, কলকাতা: দীপ প্রকাশন (প্রথম প্রকাশ ১৯১০)
- রায়, সুব্রত ও ব্যানার্জী, অরীন্দ্রজিৎ (সম্পা.) (২০২১): *চৈতন্যচর্চা: সমন্বয় ও সমাচার*, সোপান, কলকাতা
- সেন, নবীনচন্দ্র (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ) *নবীনচন্দ্র রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা: দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স
- Garratt, J.H.E (2001): *Bengal District Gazetteers Nadia, Kolkata: Department of Higher
Education, Govt. of West Bengal (First published 1910)*